সাহাবীদের আলোকিত জীবন

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল (আরবী)
ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

অনুবাদ
মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম
ড. মুহাম্মদ মঈনদ্দীন

সম্পাদনা
মাওলানা মুজাম্মিল হক
ড. আব্দুল জলীল

সবুজপত্র

সাহাবীদের আলোকিত জীবন - দ্বিতীয় খণ্ড

[SP-ID-18-09]
প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭। মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৯০-৯৪।
ওয়েবসাইট: www.sobujpatro.com,
ফেইসবুক পেইজ: fb.com/sobujpatropublicatios
অনলাইন পরিবেশক: Sahera Shop - সাহেরা শপ

স্বত্ব: সংরক্ষিত

নতুন সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫ ঈসায়ী
প্রথম প্রকাশ: ২০০৯ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: দেলোয়ার হোসেন

মূল্য: **৩৮০** (তিনশত আশি) টাকা মাত্র

صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ - ٢
تاليف: الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا
ترجمة: محمد عبد المنعم، الدكتور محمد معين الدين
مراجعة: مزمل حق، الدكتور عبد الجليل
الناشر: مكتبة سبوز بترو، داكا، بنغلاديش

STORIES FROM THE LIVES OF THE SAHABAH
(Sahabider Alokito Jibon) Vol-2
by Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha
Translated by Mohammad Abdul Monyem,
Dr. Mohammad Moinuddin
Edited by Dr. Abdul Jalil, Maulana Mojammel Haque
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: BDT **380** (Three Hundred Eighty) only.

ISBN 978-984-98906-4-5

লেখক পরিচিতি

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর সিরিয়ার আরিহা শহরে জন্ম। জন্মের চার মাসের মাথায় বাবাকে হারান। চার বছর বয়সে মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলে দাদার কাছেই লালিত-পালিত হন। সিরিয়ার প্রাচীনতম শরয়ী শিক্ষাগার হালাব শহরের মাদরাসা খুরভিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়াশোনা করেন। তারপর মিসরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে অর্জন করেন উসূলে ফিক্হের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি। আল-আজহারে পড়াশোনা শেষ করে কায়রো ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর গবেষণা সম্পন্ন করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা শিক্ষকতা, সাহিত্যসাধনা ও গবেষণাতেই জীবনভর সম্পৃক্ত ছিলেন। এক সময় দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরব সফরে গেলে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইউনিভার্সিটি থেকে অধ্যাপনার প্রস্তাব পেয়ে সেখানেই স্থির হয়ে যান। আরবি ভাষার সেবা, সাহিত্যসাধনা ও গবেষণার পাশাপাশি মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সেখানেই কাটিয়ে দেন জীবনের বাকি বাইশটি বছর।

ইসলামী সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে ড. রা'ফাত পাশা প্রধানত দুটো ভাগে কাজ করেছেন। এক. ইসলামের স্বর্ণযুগে রচিত দাওয়ামূলক কবিতা সম্ভারকে শিল্পের নিক্তিতে মেপে সমালোচনা। দুই. ইসলামের অতীত ইতিহাসকে খ্যাত ও বিস্মৃত মনীষীদের জীবনীর আদলে অনন্য রচনাশৈলিতে উপস্থাপন।

জীবনী সাহিত্যে রা'ফাত পাশা যে কাজগুলো করে গেছেন, তা আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। 'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা', 'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়াত' ও 'সুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেয়িন' শিরোনামের তিনটি গ্রন্থ তাঁকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এ ছাড়া 'আদ-দীন আল-কাইয়িম', 'লুগাত আল-মুসতাকবিল'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আরও বিপুল কাজ করে গেছেন তিনি।

৬৬ বছর বয়সে প্যারালাইসিসের কারণে ড. রা'ফাত পাশার শরীরের একাংশ বিকল হয়ে যায়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় ডাক্তারের পরামর্শে কিছু দিনের জন্য হাওয়া বদলের উদ্দেশে তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে যান এবং সেখানেই জুলাইয়ের ১৮ তারিখ মুতাবেক ১১ জিলক্বদ ১৪০৬ হিজরী শুক্রবার রাতে ইন্তিকাল করেন। ইস্তাম্বুলের ঐতিহাসিক 'ফাতেহা' গোরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়, যেখানে শুয়ে আছেন বিপুল সংখ্যক সাহাবী আজমাঈন ও তাবেয়িনে কেরাম।

***

সূচিপত্র - দ্বিতীয় খণ্ড

নং	সাহাবীদের নাম	পৃষ্ঠা
৩০	জা'ফর ইবনে আবী তালিব	৩৩২
৩১	আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস	৩৪৬
৩২	সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস	৩৫৫
৩৩	হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামান	৩৬৪
৩৪	উক্বা ইবনে আমের আল-জুহানী	৩৭৪
৩৫	বিলাল ইবনে রাবাহ	৩৮২
৩৬	হাবীব ইবনে যায়েদ	৩৯০
৩৭	আবূ তালহা আল-আনসারী	৩৯৭
৩৮	ওয়াহ্শী ইবনে হারব	৪০৪
৩৯	হাকীম ইবনে হিযাম	৪১১
৪০	আব্বাদ ইবনে বিশর	৪১৭
৪১	যায়েদ ইবনে সাবেত	৪২৩
৪২	রাবীআ ইবনে কা'ব	৪৩১
৪৩	যুল-বিজাদাইন আব্দুল্লাহ আল-মুজানী	৪৩৯
৪৪	আবুল আস ইবনে আর রাবীঈ	৪৪৫
৪৫	আসেম ইবনে সাবেত	৪৫৪
৪৬	উত্বা ইবনে গাযওয়ান	৪৬০
৪৭	নু'আঈম ইবনে মাসঊদ	৪৬৭
৪৮	খাব্বাব ইবনে আরত	৪৭৬
৪৯	রাবীঈ ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী	৪৮৩
৫০	আবদুল্লাহ ইবনে সালাম	৪৯১
৫১	খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস	৪৯৯
৫২	শুরাকা ইবনে মালিক	৫০৭
৫৩	ফাইরোয আদ্দাইলামী	৫১৭
৫৪	সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী	৫২৪
৫৫	তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত তাইমী	৫৩১

নং	সাহাবীদের নাম	পৃষ্ঠা
৫৬	আবূ হোরাইরা আদ দাওসী	৫৩৯
৫৭	সালামা ইবনে কায়েস আল-আশজাঈ	৫৫০
৫৮	মুআয ইবনে জাবাল	৫৫৯
৫৯	আলে ইয়াসের	৫৬৮
৬০	সুহাইল ইবনে আমর	৫৭৫
৬১	জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী	৫৮২
৬২	সালেম; মাওলাা আবি হুযায়ফাহ	৫৮৮
৬৩	উসমান ইবনে আফফান	৫৯৪
৬৪	আমর ইবনুল আস	৬০৪
৬৫	আবু লুবাবাহ	৬১৩
৬৬	আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা	৬১৯
৬৭	জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী	৬২৬
৬৮	উবাই ইবনে কা'ব আল-আনসারী	৬৩২

বিশেষ দ্রষ্টব্য-

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম অনূদিত এবং মাওলানা মুজাম্মিল হক সম্পাদিত জীবনীক্রম- ২-৩৪, ৩৬-৪২, ৪৪-৫০, ৫২-৫৮, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১১।

ড. মুহাম্মদ মুইনুদ্দীন অনূদিত এবং ড. আব্দুল জলীল সম্পাদিত জীবনীক্রম- ১, ৩৫, ৪৩, ৫১, ৫৯-১০৪, ১০৬, ১০৮, ১১০।

***

জা'ফর ইবনে আবী তালিব

“রক্তে রঞ্জিত দুটি পাখায় ভর করে জান্নাতে জা'ফর ইবনে আবী তালিবকে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।”

- *মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*

আবদে মান্নাফ গোত্রে পাঁচজন ব্যক্তি এমন ছিলেন, যাদের চেহারা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অপরিচিত অনেকেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাদের মধ্যে সহজে পার্থক্য করতে পারত না। ঐ পাঁচ ব্যক্তির পরিচয় জানতে নিশ্চয়ই আপনারা আগ্রহী হবেন, যাদের চেহারা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো। তারা হলেন,

১. আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচাত এবং দুধ ভাই।

২. কুসাম ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই।

৩. সায়েব ইবনে উবায়দ ইবনে আবদে ইয়াযীদ ইবনে হাশিম। তিনি ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দাদা ছিলেন।

৪. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি ফাতেমাতুয যাহ্‌রা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

৫. আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাই জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

এখানে আমরা জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

কুরাইশ বংশে আবী তালিব ছিলেন নেতৃত্বের শীর্ষে। এ কারণেই তিনি ছিলেন সকলের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। অধিকন্তু তিনি ছিলেন অনেক সন্তানের জনক। আর্থিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন দরিদ্র; কিন্তু তার দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করে যখন অনাবৃষ্টির কারণে প্রচণ্ড অভাব কুরাইশ বংশের প্রায় সব পরিবারকেই ভীষণভাবে কাবু করে ফেলে। এ বছরকে 'অনাবৃষ্টির বছর' নামে অভিহিত করা হয়। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, শস্যাদি রোদে পুড়ে যাওয়ার কারণে মানুষ শুকনো হাড্ডি পর্যন্ত রান্না করে তার সুরুয়া পান করতে বাধ্য হয়। সে সময় কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রের শুধুমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছাড়া আর কারো আর্থিক সচ্ছলতা ছিলো না।

এ অবস্থায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, 'আপনার ভাই আবী তালিব অধিক সন্তানের জনক। অভাব-অনটন যেসব পরিবারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, এ পরিবারটি তাদের অন্যতম। অনাহারক্লিষ্টতায় এ পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিস্পেষিত। আসুন, আমরা তার সন্তানদের কয়েকজনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেই। আমরা উভয়ে কমপক্ষে এক একজনের দায়িত্ব নিই।'

উত্তরে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, 'এটা নিঃসন্দেহে উত্তম প্রস্তাব।'

অতঃপর উভয়ে আবী তালিবের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বললেন,

'অভাব-অনটনের কারণে মানুষের যে দুরবস্থা তা তো দেখছেন। আপনিও অভাব-অনটনের নির্মম শিকার। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনার সন্তানদের দু'জনকে আমাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে আপনার বোঝা একটু হালকা করতে চাই।'

আবী তালিব বললেন,

'আমার বড় ছেলে আকীলকে আমার কাছে রেখে অবশিষ্টদের যাকে খুশি নিয়ে যেতে পার।'

অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জা'ফরকে তাঁদের পরিবারভুক্ত করে নিলেন। তখন থেকেই আলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারভুক্ত ছিলেন এবং তিনিই ছোটদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কিশোর সাহাবী। এভাবে চাচার বাড়িতে অবস্থানকালেই জা'ফর যৌবনে পদার্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হন।

আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস

“আমি আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেসের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। তার কৃত সমস্ত জীবনের শত্রুতা ও বিরোধিতাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে হবে জান্নাতে যুবকদের নেতা।”

-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

পারস্পরিক সম্পর্ক ও গভীর ভালোবাসার মতো যত যোগসূত্রই এ যাবৎ একে-অপরের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ ও আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেসের মধ্যে বিদ্যমান এমন যোগসূত্র খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। কারণ, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। এদিক থেকে উভয়ই সমবয়সী। যেমন তারা একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক তেমনি একই পরিবারে প্রতিপালিতও হন।

আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচাত ভাই। তার পিতা হারেস। হারেসের ভাই আবদুল্লাহ হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা। হারেস ও আবদুল্লাহ উভয়েই ছিলেন মুত্তালিবের ঔরসজাত সন্তান ।

এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়াও আবূ সুফিয়ান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই। উভয়কেই হালিমা আস সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একই সঙ্গে স্তন্য পান করিয়েছেন। এতসব যোগসূত্র পরস্পরকে নবুওয়াতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত গভীর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে আবদ্ধ করে রাখে। শুধু তাই নয়, সর্বোপরি আকৃতি দু'জনের প্রায় একই ছিলো। আবূ সুফিয়ানের ব্যাপারে সবারই ধারণা এটাই স্বাভাবিক ছিলো যে, সে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের প্রতি সাড়া দিয়ে মুসলমান হবে। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও

সর্বপ্রধানও হবে। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিলো ভিন্ন। ঘটনাও ছিলো প্রত্যাশার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের অনেকেই তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদেরকে এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকেন। ঠিক এ পর্যায়ে আবূ সুফিয়ানের অন্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গভীর বন্ধুত্ব দেখতে দেখতেই চরম শত্রুতায় পরিণত হয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময়ে আবূ সুফিয়ান কুরাইশ বংশের একজন প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী ও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। সে তার তলোয়ার ও কবিতা উভয় দ্বারাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তার সর্বশক্তি ইসলামের প্রতিরোধে ও মুসলমানদের নির্যাতন ও নিপীড়নের কাজে নিয়োজিত করে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এমন কোনো যুদ্ধই সংঘটিত হয়নি, যার উদ্যোক্তা আবূ সুফিয়ান ছিলো না। মুসলমানদের ওপর এমন কোনো অত্যাচার ও নির্যাতন হয়নি, যার বিরাট ভূমিকায় সে ছিলো না। আবূ সুফিয়ান তার কবিতার আকর্ষণীয় ভাষা, জাদুকরী ছন্দ তথা সর্বশক্তি দ্বারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো। তার কবিতায় থাকত শুধু গালিগালাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আবূ সুফিয়ানের এই হীন তৎপরতা ক্রমাগত প্রায় কুড়ি বছর যাবৎ চলতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে এ হীন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের এমন কোনো কৌশল বা সুযোগ নেই, যা সে ব্যবহার করেনি। এমন কোনো অত্যাচার ও নির্যাতন নেই, যা সে মুসলমানদের ওপর চালায়নি ও তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রাখেনি। আল্লাহর কী মহিমা! মক্কা বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে আবূ সুফিয়ানের ভাগ্য ইসলাম গ্রহণের জন্য সুপ্রসন্ন হলো । তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও একটি স্মরণীয় ঘটনা। কবি-সাহিত্যিকরা সে ঘটনাকে যেমন বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, ঐতিহাসিকগণও ইতিহাসের পাতায় তেমনি গুরুত্ব সহকারেই স্থান দিয়েছেন।

আবূ সুফিয়ান নিজেই তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘ইসলাম বিজয় লাভ করলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে দলে দলে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শীঘ্রই মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন, এ সংবাদ মক্কার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হলো, দুনিয়াটা আমার কাছে খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছিলাম এ মুহূর্তে কোথায়

বিলাল ইবনে রাবাহ

[রাসূলুল্লাহ'র মুয়ায্যিন]

"আবূ বকর আমাদের নেতা, আর তিনি মুক্ত করেছেন আমাদের নেতাকে (অর্থাৎ, বিলালকে)।"

-উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইসলামের প্রথম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত মুয়াযযিন বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রয়েছে সংগ্রামমুখর এক অনবদ্য জীবন-চরিত। এমন চমৎকার জীবন যা বার বার বর্ণনা সত্ত্বেও যুগ-প্রবাহ কোনো ধরনের ক্লান্তি বোধ করে না। যার সুর সম্মোহনে শ্রোতাদের কর্ণসমূহ কখনো তৃপ্ত হয় না।

হিজরতের প্রায় তেতাল্লিশ বছর পূর্বে 'সারাত' নামক স্থানে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন রাবাহ নামে পরিচিত। আর তার মায়ের নাম ছিল 'হামামা'। যিনি ছিলেন মক্কার কালো কৃতদাসীদের একজন। এ কারণে কেউ কেউ তাকে কালো কৃতদাসীর ছেলে বলেও ডাকত।

বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা নগরীতে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আব্দুদদার গোত্রের কয়েকজন ইয়াতিম বালকের কৃতদাস। মৃত্যুর পূর্বে ইয়াতিম বালকদের অভিভাবক হিসেবে তাদের পিতা কাফিরদের এক শীর্ষ নেতা উমাইয়া ইবনে খালফকে ওসিয়ত করে যান।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের বাণী ছড়িয়ে দিলেন গোটা মক্কায়। নতুন দীনের আলোকচ্ছটায় যখন এই নগরী উদ্ভাসিত, বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন হয়ে গেলেন। এমন এক সময়ে তিনি ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন যখন তিনি এবং অগ্রগামী কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া জগৎজুড়ে অন্য কোনো মুসলিমের অস্তিত্ব ছিল না। সেসব পুণ্যবানদের

মাঝে ছিলেন উম্মুল মুমিনীন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, আবূ বকর সিদ্দীক, আলী ইবনে আবী তালেব, আম্মার ইবনে ইয়াসির ও তার মা সুমাইয়্যা, সুহাইব রুমী ও মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করেছেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ভোগ করেনি। সেই কঠিন সময়ে তিনি এবং তার মতো দুর্বল ও অসহায় নওমুসলিমরা আল্লাহর পথে চরম ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, যা আর কারো ক্ষেত্রে হয়নি।

আবূ বকর সিদ্দীক ও আলী ইবনে আবী তালিবের পক্ষে দাঁড়ানোর মতো স্বগোত্রীয় লোকজন এবং তাদের রক্ষা করার জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ছিল। পক্ষান্তরে ঐসব দুর্বল দাস-দাসীর পক্ষে দাঁড়ানোর মতো কোনো সজ্জন ও বন্ধু ছিল না। ফলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাদের উপর চালায় কঠোর নির্যাতন। চরম অত্যাচারের মাধ্যমে তাদেরকে ঐসব লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে সচেষ্ট হয়, যারা মনেপ্রাণে তাদের দেব-দেবীর উপাসনা ছেড়ে মুহাম্মাদের অনুসরণ আকাঙ্ক্ষায় মশগুল।

এই অসহায় লোকদের উপর নির্যাতন চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে কঠিন ও নির্দয় হৃদয়ের একদল ব্যক্তি। এতে সর্বপ্রথম নেতৃত্ব দেয় আবূ জাহল (আল্লাহ তাকে অপদস্থ করুক) সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হত্যার মাধ্যমে। প্রথমে সে সুমাইয়াকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে এবং পরে বল্লম নিক্ষেপে তাঁকে আঘাত করে, যা সুমাইয়ার পেটের নিম্ন ভাগে বিদ্ধ হয়ে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বের হয়ে যায়। এতে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা শাহাদাতবরণ করেন। আর তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ।

এছাড়াও তাঁর অন্যান্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কুরাইশদের অত্যাচার ছিল অমানবিক ও দীর্ঘস্থায়ী, যাদের অন্যতম বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

দুপুরের প্রচণ্ড খরতাপে যখন মরুভূমির বালুকারাশি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তপ্ত হয়ে উঠত, তখন তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র খুলে লোহার বর্ম পরিয়ে সেই তপ্ত সূর্য তাপে তাদের ঝলসে দিত। আবার কখনও তাঁদের পিঠে চাবুক মারতে মারতে মুহাম্মাদকে গাল-মন্দ করার নির্দেশ দিত। অসহ্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সহ্যের শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ ঈমান অক্ষত রেখেই কাফিরদের চাহিদা পূরণে তারা কখনো কখনো মৌখিকভাবে তাদের কথায় সাড়া দিত। কিন্তু বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভে এসব অত্যাচার নির্যাতনকে সহ্য করে নিতেন।

হাবীব ইবনে যায়েদ

“আমার আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত ও বরকত দান করুন।”

-হাবীব ইবনে যায়েদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ।

হাবীব ইবনে যায়েদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্ধারিত জীবনধারার অমোঘ নিয়মে এমন এক পরিবারে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন, যে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই যেমন ছিলেন ঈমানী চেতনায় বলীয়ান, তেমনি এ বিপ্লবী দাওয়াত ছড়িয়ে দিতেও তাঁদের ভূমিকা ছিলো অতুলনীয়। এ পরিবারের প্রতিটি সদস্য দীনের দাবি পূরণে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সীমাহীন কুরবানীর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা জনপদের প্রত্যেককে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করত।

তাঁর পিতা যায়েদ ইবনে আসেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ইয়াসরিবের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং বায়আত আল-আকাবায় অংশ গ্রহণকারী ৭০ সাহাবীর অন্যতম ছিলেন। সে অনুষ্ঠানে তিনি দুই ছেলেসহ সস্ত্রীক বায়আত করার গৌরবে গৌরবান্বিত হন। তাঁর মা উম্মু আম্মারা নুসায়বাতুল মাযনিয়াহ ইসলামের ইতিহাসে সেই প্রথম মহিলা, যিনি আল্লাহর দীনের হেফাযত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা উহুদের যুদ্ধে নিজের বক্ষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতের জন্য ঢালস্বরূপ ব্যবহার করেন। তিনি শত্রুপক্ষের অসংখ্য তীর-বর্শার আঘাত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার গৌরবে গৌরবান্বিত সাহাবী। তাঁর

স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য এ দু'আ করেন-

بَارَكَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ

رَحِمَكُمُ اللهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ

'আমার আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত ও বরকত দান করুন।'

শিশুকালেই নিষ্পাপ হাবীব ইবনে যায়েদের অন্তর ঈমানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মা-বাবা, খালা ও ভাইয়ের সাথে মক্কাগামী ইতিহাসখ্যাত সেই সত্তর জন সাহাবীর কাফেলায় যোগদানের সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিলো। গভীর রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত বায়আতে আকাবায় শিশু হাবীবও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কোমল দু' হাত রেখে বায়আত গ্রহণ করেন এবং সেদিন থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পিতামাতার চেয়েও প্রিয় মনে করেন ও তাঁর জীবনের বিনিময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

শিশু সাহাবী হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা একান্তই ছোট হওয়ার কারণে 'বদরের যুদ্ধে' অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি যুদ্ধাস্ত্র বহনের বয়স না হওয়ায় তিনি উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণে অক্ষম হন। এর পরে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেন। এসব যুদ্ধে তিনি বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, ত্যাগ, ধৈর্য ও নৈপুণ্যে শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। বিশাল শত্রুবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাঁর তীক্ষ্ম রণ-কৌশল, দৃঢ় ঈমানী চেতনা, উচ্চ মনোবল এবং সীমাহীন মানসিক প্রস্তুতি একান্তভাবে প্রশংসনীয় ছিলো।

প্রিয় পাঠক! হাবীব ইবনে যায়েদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি রোমহর্ষক ঘটনার প্রতি আলোকপাত করতে চাচ্ছি, যা অতি ভয়ঙ্কর ও হৃদয়বিদারক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে পরবর্তী সময়ে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ঘটনার স্মরণে মানুষের অন্তর কেঁপে উঠত, ঘটনাটি সত্যিই অবিস্মরণীয়।

হিজরী নবম সালে ইসলামী রাষ্ট্র সগৌরবে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরব দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে প্রতিনিধি দল উপস্থিত হতে থাকে। ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারের ঘোষণা দানের জন্য একের পর এক বিভিন্ন আরব গোত্রের

আবূ হোরাইরা আদ দাওসী

“আবূ হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ (স) থেকে উম্মতে ইসলামের জন্য ষোলো শ’র অধিক হাদীস হিফয করে বর্ণনা করে গেছেন।”

-মুহাদ্দিসগণের উক্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কে আছে, যে আবূ হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম শোনেনি? ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে তাঁকে ‘আবদুশ শাম্‌স’ বা ‘সূর্যের দাস’ নামে ডাকা হতো। আল্লাহ তাঁকে ইসলামের গৌরবে ধন্য করেন। প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার নাম কী?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘আবদুশ শাম্‌স’।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, ‘না, আবদুশ শাম্‌স নয়, আবদুর রহমান।’

তিনি বললেন, ‘জী হ্যাঁ, আবদুর রহমান। রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা ও মাতা কুরবান হোক। এখন থেকেই আমার নাম আবদুর রহমান।’

কিন্তু আবদুর রহমানের চেয়ে তিনি তাঁর ডাকনাম আবূ হোরাইরা নামেই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তাঁকে আবূ হোরায়রা হিসেবে ডাকার একটি বিশেষ কারণও ছিলো। শিশুকালে তাঁর ছোট্ট একটি বিড়ালছানা ছিলো, যাকে নিয়ে তিনি প্রায়ই খেলা করতেন। যে কারণে তাঁর সমবয়সী অন্যান্য শিশুরা তাঁকে ‘বিড়াল ছানাওয়ালা’ বা ‘আবূ হোরায়রা’ বলে ডাকত। আস্তে আস্তে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। তার প্রকৃত নামে খুব কম লোকই তাঁকে ডাকত। পুরুষ বিড়ালছানাকে ‘র্হির’ এবং ছোট্ট

স্ত্রী বিড়ালছানাকে 'হোরায়রা' বলা হয়। পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে উত্তম, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সময় আদর ও স্নেহ করে তাঁকে 'আবূ হুরির' বলে ডাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখা নামের পাশাপাশি তাঁর শিশুকালের নামটিই সর্বজনীন হয়ে পড়ে।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্ব করে বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'আবূ হুরের' নামে ডেকেছেন।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়েল ইবনে আমের আদ দাওসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইয়ামেনের দাওস গোত্রেই বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করার জন্য মদীনায় আসেন। দাওস গোত্রের এই যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকতেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। মাসজিদে নববীকেই নিজের আশ্রয়স্থল ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষা গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন। সে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি বিয়ে করেননি। একমাত্র বৃদ্ধা মা ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিলো না। কিন্তু তাঁর মা ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে পৌত্তলিকতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এতে বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত ধৈর্য ও বিনয়ের সাথে তাঁর মাকে সর্বদা ইসলামের পথে আহ্বান জানাতেন। তিনি অব্যাহতভাবে তাঁর মাকে কালেমা শাহাদাতের দাওয়াত দিতে থাকেন। অপরদিকে তাঁর মা সর্বদাই এই দাওয়াত অবজ্ঞা করত। তাঁর মা শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুবই চিন্তিত ও ব্যথিত থাকতেন। একদিন তাঁর মাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। উত্তরে তাঁর মা রেগে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এমন কটূক্তি ও আপত্তিকর কথা বলল, যা আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে খুবই পীড়া দেয়। তিনি মায়ের এই কটূক্তি ও গালিগালাজ শোনার পর খুবই দুঃখিত ও ব্যথিত মনে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟

'আবূ হোরায়রা, কী জন্য কাঁদছ?'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন, 'আমি সর্বদা আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম। তিনিও সর্বদা আমার দাওয়াতকে